॥ শ্রীহরি ॥
বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দেজগদ্গুরুম্।।

॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বিবেচন সারসংক্ষেপ ॥

অধ্যায় 18: মোক্ষসন্ন্যাসযোগ

5/6 (শ্লোক 40-53), শনিবার, 28 অক্টোবর 2023

ব্যাখ্যাকার: গীতা বিশারদ ড: সঞ্জয় মালপাণী মহাশয়

ইউটিউব লিঙ্ক: https://youtu.be/B94DFtrkmJ0

স্বভাবগত কর্তব্য কর্মের ভিত্তিতে গঠিত চারটি বর্ণ

ভগবানের মঙ্গল প্রার্থনা, দীপ প্রজ্জ্বলন এবং স্বামী গোবিন্দদেব গিরি জী মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে আজকের এই সুন্দর বিবেচন সত্র আরম্ভ হয়। পূর্ববর্তী বিবেচন সত্রে অষ্টাদশ অধ্যায়ের শ্লোকের মাধ্যমে ভগবান শ্রী কৃষ্ণ তিন প্রকারের সুখ - **সাত্ত্বিক সুখ, রাজসিক সুখ, তামসিক সুখের বর্ণনা করেছেন।**

18.40

ন তদস্তি পৃথিব্যাং(ম্) বা, দিবি দেবেষু বা পুনঃ
সত্ত্বং(ম্) প্রকৃতিজৈর্মুক্তং(ম্), যদেভিঃ(স্) স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ॥40॥

পৃথিবীতে বা স্বর্গে (মনুষ্য বা দেবতা) এমন কোনো প্রাণী বা বস্তু নেই, যা প্রকৃতি হতে উৎপন্ন এই তিন গুণ রহিত। ৪০

বিবেচন: ভগবান বলেছেন, পৃথিবী, আকাশ বা দেবতাগণ বা **এই সৃষ্টির মধ্যে এমন কোনো তত্ত্ব নেই যা তিনটি গুণ থেকে বর্জিত।** এই তিনটি গুণ প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। অতএব, এই গুণগুলি এই পৃথিবীর যে সমস্ত প্রাণী বা তত্ত্ব রয়েছে, তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপ্ত রয়েছে। ভগবান পুনরায় ব্যাখ্যা করেছেন যে বিভিন্ন বর্ণের কি কাজ এবং তার কি কি বৈশিষ্ট্য। শ্রী কৃষ্ণ বলেছেন যে এই চারটি বর্ণ আমার দ্বারাই নির্মিত হয়েছে। প্রতিটি বর্ণের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেই অনুসারেই ব্যক্তির বর্ণের বিভক্তি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে, তার বর্ণনা নিম্নলিখিত রূপে দেওয়া হয়েছে-

1. **গুণ** - একজন ব্যক্তির গুণ অর্থাৎ যোগ্যতা কি?
2. **কর্ম-** একজন ব্যক্তির কর্ম অর্থাৎ অনুভব কি?

এই অনুসারে, সমস্ত প্রাণীদের চারটি বর্গে ভাগ করা হয়েছে। বাস্তবে এই বিভাজন কর্মের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে, জন্মের উপর নয়। এখানে লক্ষণীয় যে, আমরা শুধুমাত্র বর্তমান জন্মের কর্মফল নয়, **পূর্ববর্তী বহু জন্মের কর্মফল অনুযায়ী বর্তমান জন্ম প্রাপ্ত করি।** আমাদের মনে রাখা উচিত যে কিছু আমাদের নিজস্ব কর্মের কারণে প্রাপ্ত হয় এবং কিছু বংশ-পরম্পরাগত বৈশিষ্ট্যের কারণে যা আমরা নিজের পিতামাতা বা পূর্বপুরুষদের থেকে প্রাপ্ত

করেছি। যেমন বাবা-মায়ের যা যা গুণ রয়েছে, সন্তানদের মধ্যেও সেই গুণগুলো দেখা যায়। তাদের মধ্যেও একই প্রকার প্রবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায়। তবে এটি সবচেয়ে বেশি মানুষের কর্মের উপর ভিত্তি করেই হয়। আমাদের সংস্কৃতিতে বর্ণ পরিবর্তনও করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ- **রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হওয়ার জন্য অনেক ধরনের তপস্যা ও বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তিনি কঠোর তপস্যার মাধ্যমে ব্রহ্মর্ষি হয়েছিলেন।**

18.41

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং(ম্), শূদ্রাণাং(ঞ্) চ পরন্তপ
কর্মাণি প্রবিভক্তানি, স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥41॥

হে পরন্তপ ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তথা শূদ্রদের কর্ম স্বভাবজাত গুণ-অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। ৪১

18.42

শমো দমস্তপঃ(শ্) শৌচং(ঙ্), ক্ষান্তিরার্জবমেব চ
জ্ঞানং(ম্) বিজ্ঞানমাস্তিক্যং(ম্), ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥42॥

অন্তঃকরণের সংযম, ইন্দ্রিয়াদি দমন, ধর্মপালনের জন্য কষ্টস্বীকার করা, অন্তরে ও বাইরে শুচিতা(১) রক্ষা করা, অপরের অপরাধ ক্ষমা করা, কায়মনোবাক্যে সরল থাকা, বেদ, শাস্ত্র, ঈশ্বর এবং পরলোকাদিতে শ্রদ্ধা রাখা, বেদাদি গ্রন্থের অধ্যয়ন-অধ্যাপন করা এবং পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করা—এ সবই হল ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম। ৪২

স্বভাবের অর্থ হলো, আমাদের স্বরূপ, প্রকৃতি। **আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিকে আমাদের স্বভাব বলা হয়**। উদাহরণস্বরূপ: একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণকারী শিশুর মধ্যে ব্রাহ্মণ বর্ণের সমস্ত গুণ নাও থাকতে পারে। অনেক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নেওয়া বালকরা মাছ ইত্যাদি খায়। এমনকি তাদের মদ খেতেও দেখা যায়। অতএব, আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিই আমাদের বর্ণের ভিত্তি হয়।

ছোটবেলায় আমরা যত গল্প পড়েছি,সেই সব গল্পগুলোতেই প্রায়ই একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ থাকতো। এর কারণ ছিলো যে, তিনি তার ধর্ম পালন করার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করতেন এবং নিজেকে শুদ্ধ রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতেন। (অর্থ উপার্জনের জন্য অনেক সময় মনের শুদ্ধতা ত্যাগ করতে হয় এবং অনেক অন্যায় কাজ করতে হয়।)

শ্রী কৃষ্ণ, এখানে ব্রাহ্মণ বর্ণের মূলস্বভাবের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন

- ক্ষমাশীল প্রকৃতির মানুষ ।
- যিনি মন ও ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন।
- যিনি সরল।
- যিনি বেদ, শাস্ত্র, ঈশ্বর এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসী।
- যিনি বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও অধ্যাপনা করেন।
- শিক্ষাদান ও অধ্যয়নের বংশানুক্রমিক গুণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। **পরমাত্মা তত্ত্বকে প্রাপ্ত করে নেওয়া, গুরু তত্ত্বকে প্রাপ্ত করা, এই হলো ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম।**

18.43

শৌর্যং(ন্) তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং(ম্), যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্
দানমীশ্বরভাবশ্চ, ক্ষাত্রং(ঙ্) কর্ম স্বভাবজম্॥43॥

শৌর্য, তেজ, ধৈর্য, দক্ষতা, যুদ্ধ হতে পলায়ন না করা, দান করা এবং শাসনক্ষমতা—এই সবই হল ক্ষত্রিয়দের স্বভাবজাত কর্ম। ৪৩

ক্ষত্রিয় বর্ণ- স্বামিত্ব ভাব অর্থাৎ আমিই মালিক। এই ভাব ক্ষত্রিয় ধর্মে পরিলক্ষিত হয়। এইজন্যেই রাজা হওয়ার অধিকার ক্ষত্রিয়দের আছে। এর সাথে সাথে ক্ষত্রিয়ের অন্যান্য গুণগুলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে-

- নিজের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।
- নিজের দেশকে রক্ষা করা।
- নিজের প্রজাকে আক্রমণ থেকে বাঁচানোর সাহস ও ধৈর্য থাকতে হবে।
- তাকে তেজস্বী হতে হবে।
- কৌশলী হতে হবে।
- মনে কোনো ভয় থাকা উচিত নয়।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ক্ষত্রিয় ধর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। মহাভারতের যুদ্ধে প্রিয়জনকে হারানোর ভয়ে অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। অর্জুন বলেছিলেন যে প্রিয়জনকে হারিয়ে রাজ্যপাট ভোগ করে কি হবে? এই মনোভাবের কারণে অর্জুনের মনে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করার অনুভূতি জেগে উঠেছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, হে ভরত! পালিয়ে যেও না, জেগে ওঠো।

পালিয়ে যেও না, জেগে ওঠো! এটি গীতার মূল মন্ত্র, এর দ্বারাই শ্রী কৃষ্ণ তাঁর প্রিয় বন্ধু অর্জুনের পরাক্রম জাগ্রত করেছিলেন।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, শ্রী কৃষ্ণ যদি অর্জুনের পরিবর্তে কোনো ব্রাহ্মণকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার জ্ঞান প্রদান করতেন, তাহলে তিঁনি ধ্যান ও জ্ঞানের কথার ওপর বেশি জোর দিতেন। ভগবান ব্রাহ্মণদের বুঝিয়ে বলতেন যে হিংসা করা আপনাদের কাজ নয় কারণ আপনারা অহিংসার পূজারী। কিন্তু কেউ যদি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, তবে তাকেও ক্ষত্রিয়ই বলা হয়। সেজন্য ভগবান এখানে স্বভাবগত কর্তব্য কর্মকেই বেশি মাহাত্ম্য দিয়েছেন।

এখানে ভগবান অর্জুনকে পরাক্রমের জ্ঞান দিয়েছিলেন, কেন এই যুদ্ধ অর্জুনের জন্যে শ্রেষ্ঠ?, এ কথা বলেছেন। **ধর্মের জন্য যুদ্ধ করলে, তাতে কোন পাপ হয় না**, এটা বোঝালেন। এর সাথে সাথে ভগবান আরও বলেছেন যে একজন ক্ষত্রিয় যা অর্জন করেন, তা দান করে দেওয়া তার স্বভাবগত কর্তব্য কর্ম।

18.44

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং(ম্), বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্
পরিচর্যাত্মকং(ঙ্) কর্ম, শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥44॥

কৃষি, গোপালন, ক্রয়-বিক্রয়রূপ সত্য ব্যবহার (১) —এইগুলি বৈশ্যদের স্বভাবজাত কর্ম এবং সর্ব বর্ণের সেবা করা হল শূদ্রদের স্বাভাবিক কর্ম। ৪৪

বৈশ্য বর্ণ- কৃষিকাজ, ব্যবসা ইত্যাদি করা একজন বৈশ্যের স্বভাবগত কর্তব্য কর্ম।

শূদ্র বর্ণ:- তার স্বভাবগত কর্তব্য কর্ম হল সকলের সেবা করা এবং তাদের যত্ন করা।

আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিতে এমনটাই মানা হয়, এই কারণেই শ্রী বীর সাভারকর জী একজন নার্সকে সেবিকা বলে অভিহিত করেছিলেন (যিনি রোগীর সেবা করেন এবং রোগীকে সুস্থ করে তোলেন)। যিনি রোগীর প্রতি সেবার ভাব রাখেন তিনিই শূদ্র। এখানে চারটি বর্ণকেই সম্মান দেওয়া হয়েছে। বর্ণের বিভাজন তাদের স্বভাবগত কর্ম অনুযায়ী করা হয়েছে। বর্তমানে সময়েও এই একই প্রণালী মেনে চলা হয়, যেমন ক্লাস ওয়ান অফিসার, ক্লাস টু অফিসার, ক্লাস থ্রী এবং ক্লাস ফোর কর্মচারী। প্রত্যেকেই তাদের নিজের নিজের দায়িত্ব অনুযায়ী কাজ করে। চতুর্থ শ্রেণীর একজন কর্মচারী কোনো সরকারি কাগজে স্বাক্ষর করতে পারে না কারণ তার সেই অধিকার নেই। প্রত্যেকের নিজস্ব অধিকার আছে এবং তারা তাদের অধিকার অনুযায়ী কাজ করে এবং সেইমতো নিয়ম পালন করে। যিনি যে বিভাগের অধিকারী, তিনি তার অধিকার অনুযায়ী বিভাগীয় পরিপত্র(বিজ্ঞপ্তি) স্বাক্ষর করতে পারেন। প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষত্ব আছে, প্রতিটি পদের নিজস্ব বিশেষত্ব আছে এবং যদি এই নিয়মগুলি পালন না করা হয় তবে সেই ব্যক্তি তার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়। ঠিক যেমন সেনাবাহিনীতে নিয়োজিত একজন সৈনিকের দায়িত্ব সীমান্ত রক্ষা করা। অন্য কোনো বিভাগের একজন কর্মকর্তা সীমান্তে গিয়ে একজন সৈনিকের কাজ করতে পারেন না কারণ তিনি সেই ধরনের শিক্ষা প্রাপ্ত করেননি, এবং না তার কাছে সেই অধিকার আছে, না তার কাছে অস্ত্র রাখার অধিকার আছে। বর্তমান কালে ক্ষত্রিয় হওয়ার অধিকার সেনাবাহিনী ও পুলিশ কর্মচারীদের দেওয়া হয়েছে।

একইপ্রকারে সমাজ সেবা করার ভাব যে বর্ণের মধ্যে আছে তা হল শূদ্র বর্ণ। এখানে ভগবান স্বভাবগত কর্তব্য কর্ম অনুসারে আমি কে তা চিহ্নিত করার জন্য আমাদের চেকলিস্ট দিয়েছেন।

একজন রাজনীতিবিদের পরিবারে জন্ম নেওয়া সন্তানের মধ্যে সেই কাজের বিশেষত্ব না থাকলে সে চেষ্টা করেও ভালো রাজনীতিবিদ হতে পারবে না। যদি কোনো পরিবারের শিশু স্বভাবগতভাবে খুব ভালো চিত্রশিল্পী হয়, কিন্তু প্রতিবেশীর সন্তানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে তাকে ইঞ্জিনিয়ারিং বা আইআইটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তাহলে সেই শিশুটি, যে একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হতে পারতো, সে পেশায় ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যায়। যে শিশুটি স্বভাবগতভাবে চিত্রশিল্পী হতে পারতো, সে একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়। পিতামাতার অপূর্ণ প্রত্যাশা সেই সন্তানের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। একইভাবে, সঙ্গীতশিল্পের গুণসম্পন্ন কোনো শিশুকে যদি আইনজীবী হতে বাধ্য করা হয়, তাহলে সে ভালো আইনজীবীও হতে পারে না, ভালো গায়কও হতে পারে না। তাই ঈশ্বর বারবার স্বভাবকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। আপনার স্বভাবগত কর্মকে লক্ষ্য করুন। তাই সন্তানকে তার স্বভাব অনুযায়ী এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করা বাবা-মায়ের দায়িত্ব। শিশু তার বংশগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে তার স্বভাব প্রাপ্ত করে। গায়ক বাবা-মায়ের ছেলের মধ্যে ভালো গায়ক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যদি সেই সম্ভাবনার অভাব থাকে, তাহলে সন্তানের স্বভাব অনুযায়ী তার ভবিষ্যৎ বা পেশা (career) বেছে নিন।

18.45

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ(স্), সংসিদ্ধিং(ম্) লভতে নরঃ
স্বকর্মনিরতঃ(স্) সিদ্ধিং(ম্), য়থা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥45॥

নিজ নিজ স্বভাবজাত কর্মে তৎপর ব্যক্তি ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ পরমসিদ্ধি লাভ করেন। নিজ স্বাভাবিক কর্মে তৎপর ব্যক্তি কীরূপে কর্মের দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভ করেন, আমার নিকট সেই বিধি শোনো। ৪৫

18.46

য়তঃ(ফ্) প্রবৃত্তির্ভূতানাং(ম্),য়েন সর্বমিদং(ন্) ততম্
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য, সিদ্ধিং(ম্) বিন্দতি মানবঃ ॥46॥

যে-পরমেশ্বর হতে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে এবং যিনি সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত(১) হয়ে আছেন, সেই পরমেশ্বরকে নিজের স্বাভাবিক কর্মের দ্বারা অর্চনা করে(২) মানুষ পরম সিদ্ধি লাভ করে। ৪৬

যিনি তার কাজ কুশলতার সাথে করেন তাকে যোগী বলা হয়। যে ব্যক্তি তার স্বভাব বা প্রকৃতিকে অনুধাবন করে নিজের কর্ম সম্পাদন করে সেই সিদ্ধি লাভ করে। সে নিজের কাজে পারদর্শিতা অর্জন করে, সে বাস্তবে ঈশ্বরের সমীপে পৌঁছে যায় কারণ প্রতিটি কাজ কুশলতাপূর্বক করার সাথে সাথে সে সিদ্ধি লাভ করতে শুরু করে। তাই সে প্রসন্নচিত্তে স্থিরতার সাথে নিজের কাজ করে যায়। উদাহরণ: একজন চিত্রকর যদি খুব সুন্দর চিত্র তৈরি করেন, তবে স্বাভাবিকভাবেই সেই ছবি তৈরি করার সময় তিনি তার পারিপার্শিক জগতের কথা ভুলে একাগ্রচিত্তে নিজের কাজের মধ্যে ডুবে যান এবং সেই কাজের ধ্যানে লীন হয়ে যান। একইপ্রকারে, একজন গায়ক যখন গান গাইতে শুরু করেন, তখন তিনিও গান গাইতে গাইতে ধ্যানে লীন হয়ে যান। একজন নর্তকী যখন মগ্ন হয়ে নাচতে শুরু করেন, তখন তিনিও ধ্যানে লীন হয়ে যান। যেমন মীরাবাঈ যখন ভক্তির ধ্যানে লীন হয়ে গেলেন -

ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। (মীরা ভক্তিতে লীন হয়ে গেলেন)

একজন ব্যক্তি কিভাবে জীবনে যশপ্রাপ্ত করতে পারেন? এর সূত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভগবান বলেন- যখন একজন বক্তা তার মনোমুগ্ধকর বাচনভঙ্গির মাধ্যমে সমস্ত শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে নেন, তখন সেটাও একপ্রকার সমাধিতে লীন হয়ে যাওয়া বলা যায়। একজন গায়ক যদি অর্থ উপার্জনের জন্য একটি মধুর গান গায়, তবে সে তা থেকে অর্থ উপার্জন করতে পারে, কিন্তু সেই গানটি যদি ভগবান প্রাপ্তির জন্য গাওয়া হয় তবে সে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করবে। সে মীরার ন্যায় ভগবানের ভক্তিতে লীন হয়ে যায়। যদি একজন ভক্ত তার রচিত কাজ ভগবানকে উৎসর্গ করেন তাহলে তিনি তুলসীদাস জীর ন্যায় হয়ে যান। সেই ভক্তের জীবনে এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন প্রতিটি মানুষের মধ্যেই তিনি ভগবান রামকে দেখতে পান। তার মনে হয় যে তিনি নিজেই যেন ভগবানকে চন্দনের তিলক লাগিয়ে দিচ্ছেন। একজন গুরু তার কাছে আসা প্রতিটি শিষ্যকে বালকৃষ্ণের রূপ বলে মনে করেন এবং প্রতিটি কর্মের মাধ্যমে তিনি শ্রী বালকৃষ্ণের পূজা করতে চান। এই ভাব যখন গুরুর মনে থাকে, তখন শিক্ষক রূপে গুরুও সিদ্ধি লাভ করেন। সমাজে এমন শিক্ষক খুব সম্মানিত হন, সকলে তার সামনে মাথা নত করে। একজন তপস্বী সাধক, রাজার চেয়েও উচ্চ আসনে আসীন হন। তাই আমাদের দেশে সাধুদের মহারাজ বলা হয়। রাজা অর্থাৎ যিনি পৃথিবী জয় করেন, মহারাজ অর্থাৎ যিনি মনকে জয় করে নেন। এই কারণেই শ্রী ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ বলা হয়। **সমর্থ শ্রীরামদাস স্বামীজি বীর শিবাজী মহারাজ সম্বোধন করে বলেছেন - তিনি মানুষকে জানেন, তাই তিনি মহারাজ কারণ তিনি মনকে জয় করতে জানেন**। একজন ভালো শিক্ষক তার শিষ্যের দিকে তাকালেই বুঝতে পারেন যে তার মনের কি ভাব। যখন তিনি কোনো দুঃখী শিষ্যের পিঠে হাত রাখেন, তখন তিনি তার হৃদয় স্পর্শ করেন এবং শিষ্যটি শিক্ষকের কাছে তার মনের সমস্ত অনুভূতি প্রকাশ করে। আমাদের স্বাভাবিক কর্ম আমাদের আরাধনা হয়ে উঠুক, একে বলা হয় শ্রেষ্ঠ পূজা। ভগবান আদিশঙ্করাচার্য মানস পূজা করতেন। ভগবান মহাদেবের আরাধনা করতে করতে বলতেন, এখন তোমার সামনে বসে থাকার কাজ শেষ হয়েছে। এখন আমি আমার কাজ করি, কিন্তু আমি যে কাজেই নিয়োজিত থাকি, তখনও যেন আমি তোমার পূজোই করতে থাকি। আমার পদচারণা যেন তোমার প্রদক্ষিণ হয়ে ওঠে। আমার সব কথা যেন তোমার মন্ত্র হয়ে ওঠে। আমার নিদ্রা যেন তোমার ধ্যান হয়ে ওঠে। আমি যে কাজই করি না কেন তা যেন তোমার পূজা হয়ে যায়। এই বিচার-ভাবনা এক সুন্দর এবং মহৎ আত্মার পরিচায়ক।

তাই নিষ্ঠার সাথে আমাদের স্বভাবগত কর্ম করে যাওয়া উচিত। আমরা যদি অন্যের অনুকরণ করে কোনো কাজ করি তাহলে তাতে সিদ্ধি প্রাপ্ত করা অসম্ভব। প্রতিবেশীর সন্তান যদি ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হয়ে যায়, তাহলে আমার সন্তানকেও ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে, এমনটা ভাবা ঠিক নয়। তাহলে আপনার সন্তান কখনোই ভালো ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে না, এটা নিশ্চিত। ইচ্ছে না থাকলে জোর করে কোনো কাজ করলে সুফল পাওয়া যায় না। যদি কোনো দোকানদার ভাবে যে সে সীমান্তে গিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে সক্ষম, তাহলে সেটা তার ভুল ধারণা, কারণ তার সে ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞতার নেই এবং তার ফলস্বরূপ তার মৃত্যুও হতে পারে। কিন্তু তিনি যদি ভালো ব্যবসা করেন এবং ব্যবসা থেকে উপার্জিত অর্থ থেকে সময়মতো কর পরিশোধ করেন, তাহলে তার দেওয়া এই কর সেনাবাহিনীর জন্য একটি অমূল্য যোগদান হবে। একটা সময় ছিল যখন ভারতবর্ষে আমরা মোবাইল ফোন বিদেশ থেকে আমদানি করতাম। আজ, "মেক ইন ইন্ডিয়া" প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় নম্বর রপ্তানিকারক হয়ে উঠেছে। সড়ক-মহাসড়ক, সব ক্ষেত্রেই ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। এমনটা হয়েছে কারণ আমরা কারোর অনুকরণ করিনি, নিজের স্বভাবগত কর্মই করেছি।

18.47

শ্রেয়ান্স্বধর্মো বিগুণঃ(ফ্), পরধর্মাৎস্বনুষ্ঠিতাত্
স্বভাবনিয়তং(ঙ্) কর্ম, কুর্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥47॥

উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত অন্যের ধর্ম হতে গুণরহিত স্বধর্ম শ্রেষ্ঠ ; কারণ স্বভাবনির্দিষ্ট স্বধর্মরূপ কর্মে মানুষের পাপ হয় না। ৪

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ধর্মের একমাত্র অর্থ হলো -কর্তব্য। নিজের কর্তব্য নিষ্ঠাপূর্বক পালন করা। শ্রীমদ্ভগবদগীতা পাঁচ হাজার বছর পূর্বে রচিত হয়েছিল। তখন মানুষের কর্তব্যকে তার ধর্ম বলে মনে করা হতো। অন্যান্য ধর্ম যেমন খ্রিস্টান ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, ইহুদি ধর্ম সহস্র বছর পরে তৈরি হয়েছিল। আমাদের চিরন্তন সনাতন সংস্কৃতিতে আমাদের স্বভাবগত কর্মকেই অত্যন্ত আবশ্যক বলে বিবেচনা করা হতো। কর্তব্যকে নিষ্ঠাপূর্বক পালন করা একজন মানুষের ধর্ম বলে মনে করা হতো।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা ধর্মের ব্যাখ্যা করে।

ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক বলা গীতার প্রথম শ্লোকের প্রথম বর্ণ 'ধর্ম ক্ষেত্রে' বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জীবনও একটি ধর্ম ক্ষেত্র। আমাদের জীবনে প্রতিদিন অনেক ধরণের
প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখা দেয়। এ কারণে মন ও বুদ্ধির মধ্যে পারস্পরিক মতভেদ চলতেই থাকে। এটা বোঝা এবং জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সঞ্জয়, যিনি দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত করেছিলেন, তিনিই গীতাজির শেষ শ্লোকের শেষ কথাটি বলেছিলেন, সেই শব্দটি ছিল মমঃ। গীতাজির প্রথম অক্ষর হল 'ধ' এবং শেষ অক্ষরটি 'ম', এই দুটি অক্ষর দিয়ে 'ধর্ম' শব্দটি গঠিত, তাই এখানে ভগবান বলেছেন, যে ব্যক্তি কর্ম করার সময় ধর্ম মেনে চলে, সে পাপ অর্থাৎ কিল্বিষম্ প্রাপ্ত করে না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন যে ধর্ম রক্ষা করার জন্য কর্তব্য পালন করার হেতু তুমি যুদ্ধ কর। হে পার্থ! এই যুদ্ধে মানুষ আহত হলেও কর্তব্যবোধ থেকে করা কাজ কখনোই পাপ হয় না। একজন ক্ষত্রিয়র কর্তব্য হলো তার দেশের মানুষকে রক্ষা করা। আততায়ী বা সন্ত্রাসীদের হাত থেকে জনগণকে বাঁচানো। তাদের দণ্ড দেওয়া একজন ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য। ভগবান বলেছেন যে স্বভাবগত কর্তব্য কর্ম করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন বৈশ্য যদি ক্ষত্রিয়ের কাজ করতে চায় এবং অন্যদিকে একজন ক্ষত্রিয় যদি বৈশ্যের কাজ করতে চায় তবে সে নিষ্ঠা বা মন থেকে সেই কাজ করতে পারে না কারণ তা তার স্বভাব অনুযায়ী কর্ম নয়।

স্বভাব শব্দেরও দুটি অর্থ রয়েছে - একটি যা আমাদের মনের ভাব অর্থাৎ স্বভাব। অন্য অর্থটি হল সহজাত অনুভূতি অর্থাৎ যা জন্ম থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। আমাদের বংশগত বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা যে সহজাত ক্ষমতা পাই তা আমাদের স্বভাব গঠনে প্রধান ভূমিকা পালন করে। তবে এই কথাটি সর্বত্র সত্য হবেই, তা আবশ্যক নয়। ঠিক যেমন একজন কুশল(পারদর্শী) নেতার ছেলেও যে কুশল নেতা হবেই, তা আবশ্যক নয়। আগামী দিনে আমাদের অনেক ভেবেচিন্তে দেশের নেতা নির্বাচন করতে হবে। এটা আমাদের দেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একটি ছোট শিশুও স্পর্শের মাধ্যমে তার মাকে চিনতে পারে। শ্রী কৃষ্ণও সুন্দরী স্ত্রীর ছদ্মবেশে আসা পুতনা রাক্ষসীকে চিনে নিয়েছিলেন। প্রতিটি মা তার সন্তানের স্পর্শ চেনেন। এটাও দেখা গেছে যে বাইরে প্রবল বজ্রপাত হলেও মায়ের মন বিচলিত হয় না, তিনি গভীর ঘুম থেকে জেগে ওঠেন না কিন্তু তার শিশুটি ঘুমের মধ্যে একটু নড়াচড়া করলেই মা জেগে ওঠেন। এটাই মায়ের স্বভাব। স্বভাব বিপরীত কাজ করা সবসময় ক্ষতিকর হয়। যেমন একটি মাছ যদি জলের পরিবর্তে উৎকৃষ্ট মানের ঘিতে সাঁতার কাটতে চায়, সেটা কি কখনো সম্ভব? মাছটি এটা করতে পারবে না, অন্যথায় তার মৃত্যু হয়ে যাবে। নোংরা জায়গায় বেড়ে ওঠা পোকাকে যদি গুড়ের মণ্ডতে রাখা হয় তবে সে বাঁচতে পারবে না, অর্থাৎ স্বভাব অনুযায়ী কাজ ছেড়ে অন্য কাজ করে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত করা যায় না।

18.48

সহজং(ঙ্) কর্ম কৌন্তেয়, সদোষমপি ন ত্যজেত্
সর্বারম্ভা হি দোষেণ, ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥48॥

অতএব, হে কুন্তীপুত্র ! দোষযুক্ত হলেও সহজকর্ম(১) ত্যাগ করা উচিত নয়, কারণ ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় সমস্ত কর্মই কোনো না কোনোভাবে দোষযুক্ত। ৪৮

ভগবান বলেন, হে কৌন্তেয়! দোষযুক্ত হলেও স্বভাবগত কর্ম করে যাওয়াই ঠিক। তাকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, অগ্নিকে সবচেয়ে পবিত্র বলে মনে করা হয়। পবিত্র অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেই চারটি বেদের গুণগান করা হয়। কিন্তু এতে কালো ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় কারণ আগুন জ্বালাতে ব্যবহৃত কাঠের ভেতরে সামান্য জল থাকলেও ধোঁয়া বের হয়। এটা একটি দোষের ন্যায় আগুনের সাথেই থাকে। বাস্তবে, প্রতিটি কাজেই কিছু না কিছু দোষ-ত্রুটি থাকে। রান্না করার সময় আমরা যখন উনুন জ্বালাই, তখন আশেপাশের অনেক পোকা-মাকড় এই আগুনে পুড়ে যায়। আমরা যখন জল ফোটাই তখন জলের মধ্যে থাকা ব্যাকটেরিয়া মারা যায়। কাপড় ধোয়ার সময়, কৃষিকাজ করার সময় অর্থাৎ প্রতিটি কাজে কোনো না কোনো ক্ষুদ্র জীব আহত হয়। আমরা যদি সবচেয়ে পবিত্র ব্যবসা হিসেবে বিবেচিত দুধের ব্যবসার দিকে তাকাই, তাহলে বাস্তবে এই দুধ কিন্তু বাছুরের জন্যই থাকা উচিত, তা আমরা নিজের বাড়িতে নিয়ে আসি। বাছুরের দুধ বাড়িতে এনে বিক্রি করাও পাপ। আগেকার দিনে এই কারণেই ভারতে দুধ বিক্রি করা হতো না। অতিরিক্ত দুধ আশেপাশের বাড়িতে বিতরণ করা হতো। আমাদের সংস্কৃতিতে কখনই দুধ ও জ্ঞান বিক্রি করা হতো না। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় গুরু শিক্ষা প্রদান করতেন। গুরুকুলের অন্তিম দিনে শিষ্যরা নিজের ইচ্ছানুযায়ী গুরুকে গুরুদক্ষিণা দিতেন। কিন্তু কিছু কারণবশত, (দ্রোণের কাছে পুত্র অশ্বত্থামাকে দুধ খাওয়ানোর অর্থ ছিল না এবং ময়দায় জল মিশিয়ে তাকে দুধ বলে খাওয়াতে হয়েছিল) গুরু দ্রোণ পাণ্ডব ও কৌরব রাজপুত্রদের অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। এখানেই তার পতন শুরু হয়।

যুদ্ধে আমার হাত প্রিয়জনের রক্তে রঞ্জিত হবে! অর্জুনের মনে এই ভাবনা এলো যে প্রিয়জনকে হত্যা করেই আমি রাজ্য ভোগ করতে পারবো, তা অত্যন্ত অনুচিত। এই অনুভূতি তাকে বিচলিত করে তোলে। আসলে অর্জুন বহুবার কৌরবদের পরাজিত করেছিলেন। (বিরাট নগরীর যুদ্ধে, তিনি তার মোহিনী অস্ত্র দ্বারা সমস্ত কৌরব, কর্ণ এবং ভীষ্ম পিতামহকে অজ্ঞান করে যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলেন।)

এই দ্বিধা কাটিয়ে ওঠানোর জন্য শ্রী কৃষ্ণ তার পরম মিত্র অর্জুনকে বলছেন যে, যেখানে গুণ আছে, সেখানে দোষ থাকবেই। দোষ-গুণ হলো একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। আমরা যখন গুণের উর্ধ্বে গিয়ে গুণাতীত হয়ে যেতে পারি, তখন আমরা দোষেরও উর্ধ্বে গিয়ে দোষাতীত হয়ে যেতে পারবো। অতএব হে অর্জুন! যুদ্ধ করা বা আততায়ীকে হত্যা করলে কোন দোষ নেই।

তাঁর প্রিয় বন্ধু অর্জুনের মাধ্যমে, শ্রী কৃষ্ণ আমাদের সকলকে বলছেন যে আমাদের স্বভাবগত কর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে কোনো দোষ হলে, তারজন্য কোনও অপরাধবোধ থাকা উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন ডাক্তার শিশুকে ইনজেকশন দেন, তখন শিশুটি খুব কান্নাকাটি করে। ডাক্তার যদি সমবেদনার বশবর্তী হয়ে শিশুটিকে সেই ইনজেকশন না দেন তাহলে সেটা ভুল হবে। কিন্তু ডাক্তার জানেন যে এই ইনজেকশন শিশুকে অনেক রোগের সাথে লড়াই করার শক্তি দেবে এবং অনেক রোগ থেকে বাঁচাবে, তাই ইনজেকশন দেওয়াটা আবশ্যক এবং এটি করলে তিনি নিজের দায়িত্বই পালন করবেন।

18.49

অসক্তবুদ্ধিঃ(স্) সর্বত্র, জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং(ম্) পরমাং(ম্),সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥49॥

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি। সর্বত্র অনাসক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন, নিস্পৃহ, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সাংখ্যযোগের দ্বারা সেই পরম নৈষ্কর্ম সিদ্ধিলাভ করেন। ৪৯

ভগবান বলেন, যারা লোভ, মোহ, কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের মন ও ইন্দ্রিয়কে জয় করে নেয়, তারা কর্মের প্রতি নির্লিপ্ত মনোভাব রেখে কর্ম সম্পাদন করে, এই ধরনের সাধক পরম সিদ্ধি লাভ করে। উক্ত শ্লোকে নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধির অর্থ হলো কর্ম থেকে পরিত্রাণ পাওয়া নয়, কর্মকে অকর্ম করে দেওয়া। কর্ম সম্পাদন করতে আলস্যবোধ যেন না থাকে, বরং কর্মের প্রতি নির্লিপ্ত থাকুন। কর্মকে যোগ করে তুলুন।

উদাহরণস্বরূপ, একবার একজন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে সে জলে ডুবে মারা যাচ্ছে। ঘুম থেকে জেগে ওঠে সে দেখে যে সে ঘামে ভিজে গেছে; সে স্বপ্ন দেখছিল। তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, তার অন্তকরণ উপলব্ধি করে যে সে সুস্থ হয়ে বাস্তব জগতে ফিরে এসেছে। একইভাবে, যখন কেউ জ্ঞানের অনুভব করে, তখন তার মনশ্চক্ষু উন্মীলন করা এবং নিজের বিবেককে জাগ্রত করা আবশ্যক হয়ে ওঠে। এই উপলব্ধির কারণেই যুবরাজ সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করেন, মহাবীর ভগবান মহাবীর হয়ে যান। মীরাকে সাধ্বী বলা হয়। এই সেই মুহূর্ত যখন গঙ্গা সাগরে মিলিত হয়ে গঙ্গাসাগরে পরিণত হয়। যখন গীতা আমাদের জীবনের সাথে যুক্ত হয়ে যান। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজ যেন ভগবানের ধ্যান হয়ে ওঠে। তাহলে সফলতা প্রাপ্ত করা সহজ হবে। যখন এই অনুভূতি জাগ্রত হয় যে আমি নিজের কর্মের মাধ্যমে ভগবানের সেবা করছি, তখন সেই কর্মও ধ্যানে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

18.50

সিদ্ধিং(ম্) প্রাপ্তো য়থা ব্রহ্ম, তথাপ্নোতি নিবোধ মে
সমাসেনৈব কৌন্তেয়, নিষ্ঠা জ্ঞানস্য য়া পরা ॥50॥

যা জ্ঞানযোগের পরনিষ্ঠা, সেই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করে মানুষ যেভাবে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, হে কৌন্তেয় ! তুমি সংক্ষেপে তা আমার নিকট শোনো। ৫০

ভগবান বললেন, হে অর্জুন! অন্তঃকরণ(বিবেক) শুদ্ধির পর জ্ঞানের মাধ্যমে কিভাবে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, তুমি তা আমার থেকে শোনো।

18.51

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া য়ুক্তো, ধৃত্যাত্মানং(ন্) নিয়ম্য চ
শতাব্দীন্বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা, রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥51॥

18.52

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী, য়তবাক্কায়মানসঃ
ধ্যানয়োগপরো নিত্যং(ম্), বৈরাগ্যং(ম্) সমুপাশ্রিতঃ॥52॥

18.53

অহংকারং(ম্) বলং(ন্) দর্পং(ঙ্), কামং(ঙ্) ক্রোধং(ম্) পরিগ্রহম্
বিমুচ্য নির্মমঃ(শ্) শান্তো, ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥53॥

বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত, সাত্ত্বিক, মিতভোজী, শব্দাদি বিষয়সমূহ ত্যাগ করে একান্ত শুদ্ধস্থানে বসবাসকারী, সাত্ত্বিক

ধৃতির(১) দ্বারা অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় সংযম করে কায়মনোবাক্যে সংযমী, রাগ-দ্বেষ সর্বতোভাবে বর্জনপূর্বক দৃঢ় বৈরাগ্য-অবলম্বন করে তথা অহঙ্কার-বল-দর্প-কাম-ক্রোধ এবং পরিগ্রহ ত্যাগ, করে নিরন্তর ধ্যানযোগে নিরত, মমত্বশূন্য, প্রশান্তচিত্ত পুরুষ সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মে অভিন্নরূপে অবস্থান করতে সমর্থ হন। ৫১-৫৩

এই শ্লোকগুলি আসলে ভগবদগীতার সারাংশ। সর্বপ্রথম হলো - নিয়মিত খাদ্যাভ্যাস কী হওয়া উচিত। এ সম্পর্কে ভগবান শ্রী কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন যে যুক্তাহার অর্থাৎ পরিমিত আহার, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই গ্রহণ করা। হালকা সাত্ত্বিক খাবার খেতে হবে।

মুখ থেকে বের হওয়া প্রতিটি কথার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। আমাদের শরীর থেকে যা যা জিনিস নির্গত হয় যেমন- ঘাম, নোনতা চোখের জল, কানের মোম, মল এবং প্রস্রাব, এগুলো সবই দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা। উপযুক্ত শব্দ চয়ন করে আমরা আমাদের মুখের কথা মিষ্টি বা তিক্ত করে তুলতে পারি। তাই একমাত্র এই শব্দগুলোই আছে, যা আমাদের শরীর সুগন্ধের মতো বের হতে পারে। ফুলের মতো সুগন্ধিত কথা বলতে হবে। মৃদুভাষী হতে হবে। এমন বাক্য বলা উচিত যা কারো মনে উদ্বেগ সৃষ্টি না করে। মিষ্টি কথা বল। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় বাহ্যিক তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়। জিহ্বা মশলাযুক্ত খাবারের জন্য লালায়িত থাকে, কান অন্যের নিন্দা-বন্দনার শোনার জন্য তৎপর হয়ে থাকে। এসব থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা খুবই জরুরী। যা আমাদের ভুল পথে চালিত করে, প্রধানত সেগুলো এড়িয়ে চলা অত্যন্ত আবশ্যক। যিনি মন ও ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, যিনি আসক্তি ও ঘৃণাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দিয়েছেন, তিনিই বৈরাগ্য প্রাপ্ত করে নেন। যিনি দর্প ও অহংকারকে নিয়ন্ত্রণ করেন, যিনি কাম, ক্রোধ, আসক্তি অর্থাৎ মনের সমস্ত শত্রু থেকে দূরে থাকেন। এই সমস্ত ত্যাগ করে দেওয়ার পর, যে ব্যক্তি ধ্যানযোগে যুক্ত হয়ে, ধ্যানযোগ, যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, এসবের সাথে যুক্ত হয়ে যোগে অধিষ্ঠিত মমত্ববোধ শূন্যহয়ে যায়, সেই মানুষ সচ্চিদানন্দ ভগবানে স্থিত হয়ে যায়। শ্রী কৃষ্ণ বলেছেন-

- **বিশুদ্ধ বুদ্ধি যুক্ত হয়ে মনকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন**
- **নিয়মিত হালকা সাত্ত্বিক খাবার খান।**
- **যিনি শব্দ আদি ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করেছেন।**
- **যিনি ইন্দ্রিয়কে সংযমে রাখার জন্য সাত্ত্বিক বিচার-ভাবনায় নিজেকে সংযুক্ত রাখেন ।**
- **যিনি অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়কে সংযমে রাখেন।**
- **যিনি মন, কথা ও শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখেন।**
- **যিনি রাগ ও বিদ্বেষকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করেছেন।**
- **যিনি অহংকার, দর্প, কাম, ক্রোধ ও আসক্তি ত্যাগ করেছেন।**
- **এবং যিনি প্রতিনিয়ত ধ্যান এবং যোগব্যায়ামে নিযুক্ত।**
- **মমত্ববোধ শূন্য হয়ে এবং শান্ত চিত্তে তিনি সম্পূর্ণরূপে সচ্চিদানন্দে অবস্থান করেন। এই তিনটি শ্লোকের মাধ্যমে, ভগবান আমাদের সমগ্র শ্রীমদ্ভগবদগীতার সারমর্ম বলেছেন।**

::প্রশ্নোত্তর পর্ব::

প্রশ্নকর্তা:- হনুমান প্রসাদ বাগড়িয়া ভাইয়া
প্রশ্ন:- নৈষ্কর্ম্যের মাধ্যমে কীভাবে সিদ্ধি লাভ করা যায়?
উত্তর:- কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে বা ত্যাগ করে যে কর্ম করা হয় তাকে নৈষ্কর্ম্য কর্ম বলা হয়। যখন কেউ তার কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কর্ম সম্পাদন করে, তখন সে সিদ্ধি লাভ করে। একজন ব্যক্তি যদি পাঁচটি কাজ করে এবং তার মধ্যে দুটি কাজ কোনো ফলের আকাঙ্ক্ষা না রেখেই করে, তাহলে সব কাজগুলি তার 'নৈষ্কর্ম্য কর্ম' হয়ে ওঠে এবং সময়ের সাথে সাথে সেগুলির দ্বারা সে সিদ্ধি লাভ করে। "সর্ব ভূত হিতে রতাঃ" অর্থাৎ সমস্ত ভূত মাত্রের কল্যাণের জন্য কার্য করলে সিদ্ধি লাভ করা যায়।

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে ।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥২.৬৫॥
অর্থাৎ, ভগবান বারবার বলেছেন যে, যদি তুমি সমস্ত দুঃখ দূর করতে চাও, তাহলে তোমার মন যেন সর্বদা প্রসন্ন

থাকে। মন তখনই প্রসন্ন হয়ে ওঠে যখন আমরা কোনো ফলের আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই কার্য করি।

প্রশ্নকর্তা:- মঞ্জু দিদি
প্রশ্ন:-আমাদের আশেপাশের লোকেরা যখন এত তিক্ত কথা বলে, তখন আমরা কি করে ভালো কথা বলবো ?
উত্তর:- কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বা কোনো নির্জন, মনোরম জায়গায় গিয়েই ভালো ভালো কথা বলবো, এমনটা যেন না হয়। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, সেই পারিপার্শ্বিক যেন বৃন্দাবনসম হয়ে যায়। এ জন্য যা কিছু করতে হবে তা আমাদের মনের ভিতরেই হতে হবে, বাইরে নয়। আমাদের মনে দৃঢ়সংকল্প করা উচিত যে আমরা যেন ভালো শুনি, দেখি, খাই এবং আচরণ করি। তবেই আমাদের মুখ থেকে সর্বদা মিষ্টি, মধুর কথা বের হবে। একবার এক শিষ্য ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে এসে বললেন যে তার মদ খাওয়ার কু অভ্যাস গড়ে উঠেছে। এ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমি আপনার কাছে এসেছি, আমাকে কৃপা করুন। সব শুনে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একটি গাছকে শক্ত করে ধরে নিলেন এবং শিষ্যটিকে বললেন, আমাকে এই গাছ থেকে মুক্ত কর, তখন শিষ্য বললেন এই গাছটা আপনি নিজেই ধরে আছেন, গাছটা তো আর আপনাকে ধরে রাখেনি। তখন পরমহংসদেব শিষ্যকে বললেন, আমিও সেই একই কথা বলছি। আপনি এই অভ্যাসটিকে ধরে রেখেছেন, অভ্যাস আপনাকে ধরে রাখেনি। যেদিন আপনার মন এই খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করার দৃঢ়সংকল্প নেবে, সেদিন আপনি এই অভ্যাসটি ত্যাগ করতে সক্ষম হবেন।

প্রশ্নকর্তা:- নীলম গুলাটি দিদি
প্রশ্ন:- কখনও কখনও বড়দেরও কড়া কথা বলতে হয়। এমতাবস্থায় করণীয় কী?
উত্তর:- অনেক সময় বাবা-মায়ের ডায়াবেটিস রোগ থাকা সত্ত্বেও যখন তারা মিষ্টি খাওয়ার জন্য বায়না করেন, তখন তাদের পুরো মিষ্টি না দিয়ে এক টুকরো মিষ্টি দিয়ে তাদের ইচ্ছা নিবারণ করা উচিত। ইচ্ছা নিবারণ করাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখন অন্যজন অবুঝের মতো আচরণ করে, তখন সেই পরিস্থিতিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমরা অনুচিত ব্যবহার করে ফেলি। এমতাবস্থায়, প্রতিদিন রাতে একবার আমাদের মনের মধ্যে একটি তালিকা তৈরি করা উচিত যে দিনে কতবার আমরা এইরকম কটু কথা বলেছি বা কটু ব্যবহার করেছি এবং তার জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাওয়ার পর তাঁকে নিজের সারথি করে নেওয়া উচিত। সেই সঙ্গে ভগবানকে কাছে যেন এই প্রার্থনা করি যে কালকে আমি এমন ভুল না করি। পরদিন সকালে বড়দের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রণাম করুন। এই প্রণাম করায় একটি অদ্ভুত শক্তি আছে এবং আমাদের বড়রা আমাদের ভুলগুলো ক্ষমা করে দেন।

প্রশ্নকর্তা:- গায়ত্রী দিদি
প্রশ্ন:- বর্তমান সময়ে ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য কি ?
উত্তর:- আজও যখন ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধক্ষেত্রে বা দেশের সীমান্ত রক্ষা করতে যান, তখন তাদের সমস্ত দায়িত্ব তাদের স্ত্রীরাই পালন করেন। বর্তমানে নারীরাও সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করতে শুরু করেছেন এবং তারাও দেশ রক্ষার দায়িত্বপালনে অংশগ্রহণ করছেন।

প্রশ্নকর্তা:- বজরং ভাইয়া
প্রশ্ন:- সম্পত্তি বণ্টনে বড় ভাই যদি ছোট ভাইয়ের চেয়ে বেশি অংশ নিয়ে থাকেন, তবে কি বড় ভাই কর্মফল ভোগ করবেন?
উত্তর: নিশ্চয়ই বড় ভাই এর কর্মফল ভোগ করবেন। তিনি অন্যায়ভাবে তার ছোট ভাইয়ের অংশ কেড়ে নিয়েছেন। ছোট ভাই যদি সামাজিক মর্যাদার মধ্যে থেকে সম্পত্তির কাগজে স্বাক্ষর করেন, তবে এটি তার মহত্ত্ব।

আমাদের বিশ্বাস যে আপনার এই বিবেচনাটি পড়ে ভালো লেগেছে। দয়া করে নিম্নে দেওয়া লিঙ্কটি ব্যবহার করে আপনার মূল্যবান মতামত দিন -

https://vivechan.learngeeta.com/feedback/

বিবেচন সারটি পড়ার জন্য, অনেক ধন্যবাদ!
আমরা সকল গীতা সেবী, এক অতুলনীয় প্রত্যাশা নিয়ে, বিবেচনের অংশগুলি বিশুদ্ধ ভাবে আপনার কাছে পৌঁছনোর প্রচেষ্টা রাখি। কোনো বানান বা ভাষারগত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

জয় শ্রীকৃষ্ণ!
সংকলন: গীতাপরিবার – রচনাত্মক লেখন বিভাগ

প্রতি ঘরে গীতা, প্রতি হাতে গীতা!!
আসুন আমরা সবাই গীতা পরিবারের এই ধ্যেয় মন্ত্রের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের গীতাশ্রেণী উপহার হিসাবে পাঠাই।

https://gift.learngeeta.com/

গীতা পরিবার একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। এখন আপনি পূর্বে পরিচালিত সমস্ত ব্যাখ্যার (বিবেচনের) ইউটিউব ভিডিও দেখতে পারেন এবং PDF পড়তে পারেন। অনুগ্রহ করে নিচের লিঙ্কটি ব্যবহার করুন।

https://vivechan.learngeeta.com/

|| গীতা পড়ুন, পড়ান ,জীবনে গ্রহণ করুন ||
|| ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ||